বিজ্ঞান কল্পকাহিনী:

কাগজের অভিশাপ

জাকারিয়া স্বপন

তৃণার দাদী নিজের ঘরের বিছানায় বসে মাগরিগের নামাজ পড়ছিলেন। বয়স প্রায় পচাত্তর ছুই ছুই করছে। গত তিন বছর ধরে আর জায়নামাজে দাড়িয়ে নামাজ পড়া হয়ে ওঠে না। তবে নিজের মতো চলাফেরা করতে এখনও কোনও সমস্যা হয়না। বিছানায় বসেই নামাজের শেষে অনেকটা সময় ধরে তজবী জপেন। তারপর সবাই মিলে একসাথে রাতের খাবার খান।

নামাজ এখনও একটু বাকী। তিনি খেয়াল করলেন, তৃণা খুব চুপি চুপি ঘরে এসে বিছানার নীচে কিছু একটা লুকানোর চেষ্টা করছে। নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে বলে দাদী কিছু বললেন না। তৃণা বিছানার তলা থেকে বেরিয়ে ঘরের একপাশে দাড়িয়ে দাদীর নামাজ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এভাবে নামাজে মন দেয়া যায় না। আর ব্যাপারটা একটু জরুরীও মনে হচ্ছে। নইলে তৃণা এভাবে দাড়িয়ে থাকবে কেন! মনে মনে ভাবেন দাদী। তিনি নামাজে একটু বিরতি নিলেন।

তৃণার বয়স এখন এগারো। কিন্তু সে বয়সের তুলনায় অনেক বেশি গোছানো। কখনও কাউকে বিরক্ত করবে না। আর দাদীর নামাজের সময় তো অবশ্যই না।

দাদী জায়নামাজে একটু সহজ হয়ে বসে হাত দিয়ে ইশারা কওে তৃণাকে ডাকলেন।

তৃণা কাছে এলে দাদী খেয়াল করলেন, তৃণা বেশ হাপাচ্ছে। ভয়ও পেয়েছে কিছুটা মনে হচ্ছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। কিছু একটা বলতে গেলো, সেটা মুখ দিয়ে ঠিক মতো এলো না। বিরবির ধরনের কিছু শব্দ বেরিয়ে এলো।

দাদী ওকে কাছে টেনে বসালেন। তারপর মুখটা শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছে জিজ্ঞেস করলেন, "কি রে, কী হয়েছে? ভয় পেয়েছিস? "

তৃণা আবারও কিছু একটা বলতে চেষ্টা করলো। কিন্তু হাপাতে হাপাতে সেটাও বলতে পারলো না।

দাদী আবার জিজ্ঞেস করলেন, "পানি খাবি?"

তৃণা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।

দাদী অবাক হয়ে বললেন, "তুই তো নিজেই পানি খেতে পারিস। এমন হাপাচ্ছিস কেন?" তারপর একটু থেমে আবার বললেন, "আচ্ছা তুই এখানে বস। আমি পানি নিয়ে আসি।"

দাদী উঠে পানি নিয়ে এলেন। নিজের হাতে গ্লাসটা ধওে নাতনীকে পানি খাওয়ালেন। তারপর কপালে আদর করে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হয়েছে, তৃণা? আমাকে বল।"

দাদীকে তৃণা সব কিছুই বলে থাকে। এই বাড়িতে ওর মা-বাবা থাকলেও দাদীই হলেন সবচে ভালো বন্ধু। তখনও হাপাচ্ছে তৃণা। দাদী ওকে বুকে টেনে নিলেন। একটু পর কিছুটা শান্ত হলো তৃণা। দাদীর কোলে মাথা রেখে মুখ উচু করে বললো, "আমি একটা অন্যায় করে ফেলেছি, দাদী। এখন কী করবো বুঝতে পারছি না।"

দাদী তৃণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "কী করেছিস?"

তৃণা প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, "আমি একটা প্যাকেট পেয়েছি।"

দাদী আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, "কিসের প্যাকেট?"

তৃণা ভয়ে ভয়ে বললো, "বইয়ের প্যাকেট।"

দাদী আঁতকে উঠলেন। মুখটা প্রায় ফ্যাকাশে হয়ে গেলো। বিছানার পাশে ছোট টেবিলে রাখা গ্লাসটি থেকে নিজেই একটু পানি খেয়ে বললেন, "বই!"

তৃণা মাথা ঝাকিয়ে বললো, "হুম। বই। কাগজের বই!"

"কা-গ--জে-----র বই!! বলিস কি তুই! কোথায় পেয়েছিস?"

"সাগরের পাড়ে। আমি মাটি খুড়ছিলাম। মাটির তলায় ছিল।" কথাটা বলে তৃণা হাত দিয়ে বিছনার নীচের দিকে দেখালো। তারপর আবার বললো, "এখন কী করবো দাদী? মা তো একটু পরেই চলে আসবে।"

তৃণা ওর মা সোহানাকে খুব ভয় পায়। সোহানা তার স্বামী কায়েসকে নিয়ে বিকেলে বাজারে গিয়েছেন উপহার কিনতে। আজকে রাতে জামিলের জন্মদিনের পার্টি। জামিল হলো সোহানার বন্ধু ময়নার ছেলে। সোহানার বন্ধু বলে কথা। সে বাজার থেকে ফিরেই তৈরী হওয়ার জন্য হৈ চৈ শুরু করে দেবে। আর এই দাওয়াতে না গেলে তো আরো চিৎকার চেচামেচি। একমাত্র দাদীই কিছু একটা বুদ্ধি বের করতে পারেন। আজকে এই বইয়ের প্যাকেট রেখে জামিলের জন্মদিনের পার্টিতে যাওয়ার কোন অর্থই হতে পারে না। তাছাড়া জামিলকে তৃণার পছন্দও নয়। শুধু কথায় কথায় হাত ধরে ফেলে। বিরক্তিকর। তৃণা দাদীর হাত ধরে বললো, "তুমি কিছু একটা ব্যবস্থা করো।"

দাদী চিন্তিত হয়ে বললেন, "সেটা না হয় করা যাবে। কিন্তু বই এলো কিভাবে! তাও আবার কাগজের বই!"

তৃণার ভেতর আবার অস্থিরতা দেখা দিল। বললো, "আমার ভীষণ অন্যায় হয়ে গেলো। আমার তো অনেক পাপ হলো, দাদী। এখন আমি এই পাপ কিভাবে শোধরাবো?"

দাদী তৃণার কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, "বের করতো, বইগুলো দেখি।"

তৃণা বিছনার নিচ থেকে প্যাকেটটি বের করে নিয়ে এলো। ওর হাত-পা একটু কাঁপছে। প্লাষ্টিকের প্যাকেটের গায়ে কিছু মাটি এখনও লেগে আছে। দাদী তৃণার হাত থেকে প্যাকেটটি নিয়ে বিছানার উপর রাখলেন। তারপর ধীর হাতে প্যাকেটটি খুললেন। প্যাকেটের ভেতর চকচকে মলাটে তিনটি বই। দাদীর হাতে একটু কাদা লেগে গেল। তাই

তিনি আর বইগুলো বের করে আনলেন না। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর কেন যেন দাদীর চোখ দিয়ে পানি বেরিয়ে এলো।

তৃণা অবাক হয়ে বললো, "দাদীমা, তুমি কাঁদছো কেন? আমি তো বলেছি আমি অন্যায় করে ফেলেছি। আমি খুব দুঃখিত, দাদীমা।"

দাদী কিছু একটা বলতে গেলেন। কিন্তু ঠিক তখনই দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। দাদী তাড়াহুড়ো করে বললেন, "এই তোর মা-বাবা বুঝি চলে এলো। তুই বইগুলো আবার বিছনার নিচে লুকিয়ে রাখ।"

তৃণা প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বিছানার নীচে যেতে যেতে বললো, "আমরা কিন্তু আজকে দাওয়াতে যাচ্ছি না। তুমি মা'কে রাজী করাবে।"

দাদী আস্তে করে বললেন, "আচ্ছা, আমি দেখছি। তুই তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে নে। আমি দরজা খুলতে গেলাম।" বলেই দাদী ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

দাওয়াতে না যাওয়া নিয়ে একটা বিশাল ঝগড়া হয়ে গেলো। সোহানা এমনিতেই তার শাশুড়িকে সহ্য করতে পারে না। সারাক্ষণ একটা টানা-পোড়ন লেগেই আছে। আজকে যখন সোহানা শুনলো তার শ্বাশুড়ি দাওয়াতে যাবেন না, তখন মনে মনে খুশিই হয়েছিল। মনে মনে বললো, "যাক, বুড়িটা তাহলে যাচ্ছে না। ভালই হলো। আজকে একটু শান্তি মতো আড্ডা মারা যাবে।" কিন্তু মুখে অনেকটা অভিযোগের সুরেই বললো, "মা, আপনি সব সময় আমাদের সাথে এমন করেন। আমরা কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে আপনি যেতে চান না।"

তৃণার দাদী এই কথার কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি খুব ভালো করেই জানেন সোহানার মনের কথা। তিনি ড্রয়িং রুমের ছোট ইজিচেয়ারটাতে বসে থাকলেন। মনে মনে ক্ষণ গুনছেন। ওরা বেরিয়ে গেলেই বইগুলো নিয়ে আবার বসতে হবে।

সোহানা বাইরে যাবার জন্য তৈরী হয়ে এসেই হুঙ্কার ছাড়লো। শ্বাশুড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, "মা, আপনি যাবেন না ভালো কথা। কিন্তু তৃণাকে তো একটু রেডি করিয়ে দেবেন! দিন দিন তো আপনার বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে দেখছি!"

সোহানার এমন খারাপ ব্যবহার তৃণার দাদীর সহ্য হয়ে গেছে। নিজের ছেলের সামনেই এমন করে বলতে থাকে বউ। মাঝে মাঝে ভাবেন, নিজের পেটের ছেলেটা এমন কেন হলো! কায়েস বউটাকে কিছুই বলতে পারে না। নিজের ছেলের অসহায়ত্ব দেখে নিজের কাছেই খারাপ লাগে। দাদী এগুলো সহ্য করে গেলেও তৃণা আজকাল আর সহ্য করে না। মুখের উপর কথা বলে দেয়। আজও তাই করলো। বাইরের ঘরের খাবারের টেবিলের উপর পানির গ্লাস রাখা ছিল। সেটাতে পানি ঢেলে একটু খেয়ে শান্তভাবে বললো, "আমি যাবো না। তোমরা যাও, মা।"

সোহানা আরো রেগে গিয়ে বললো, "কেন যাবে না তুমি? আজকাল তোমার খুব মুখে মুখে কথা বলার অভ্যাস হয়েছে। সবকিছু নিশ্চই তোমার আদারের দাদী শিখিয়ে দিচ্ছেন?"

তৃণা দৃঢ় গলায় বললো, "দাদীকে সব কিছু শিখিয়ে দিতে হবে কেন? আমি কি কিছু দেখতে পাই না?"

সোহানা নিজের কাপড়ের ভাজ ঠিক করতে করতে বললো, "কী দেখতে পাও তুমি? কী দেখতে পাও? বেয়াদব মেয়ে। খুব বাড় বেড়েছে তোমার।"

তৃণা বললো, "মা, তোমার এগুলো শুনতে ভালো লাগবে না। তোমরা এখন যাও তো। আর চাবি নিয়ে যেও।"

সোহানা দাঁত কামড়ে বললো, "তোমাকে যেতে হবে। তুমি এক্ষুনি তৈরী হয়ে নাও।"

তৃণার হঠাৎ করেই মাথায় রক্ত চড়ে গেলো। হাতের গ্লাসটা মাটিতে ছুড়ে মারলো। গ্লাসটা মাটিতে শব্দ করে ভেঙ্গে গেলো। তৃণা চিৎকার করে বললো, "আমি বলেছি তো আমি যাবো না।"

তৃণা কখনও এমন করে না। আজকে সে একটু বেশি ক্ষেপে গিয়েছে মনে হলো। দাদী এসে তৃণাকে নিজের বুকে চেপে ধরে বললেন, "বৌমা, তোমরা যাও। আর কথা বাড়িও না।"

সোহানা আর কথা বললো না। সে বেরিয়ে গেলো। তার পেছনে কায়েসও।

ওরা বেরিয়ে গেলে তৃণা বললো, "তুমি এমন কেন দাদীমা!"

মুখে হাসি টেনে দাদী বললেন, "কেমন রে?"

"তুমি নিজের ছেলেকে, ছেলের বউকে কিছুই বলতে পারো না?"

"ওরা বড় হয়েছে। আমি আর কী বলবো?"

"তোমার সাথে মা খুব খারাপ ব্যবহার করে। তুমি কেন মাকে কিছু বলো না। তুমি কি ভয় পাও?"

"কিসের ভয়!"

"সেটা তো আমিও ভাবি। এই বাড়ি তোমার। চাষের জমি তোমার। আমরা চলি তোমার টাকায়। তোমার তো কোনও ভয় থাকার কথা নয়!"

"আমার কোনও ভয় নেই। এটাই আমার সবচে বড় ভয়।"

"তাহলে মাকে তুমি কিছু বলো না কেন? কেন তুমি সব কিছু সহ্য কর?"

"যদি বলি তোর জন্য, তুই কি সেটা বিশ্বাস করবি?"

"আমার জন্য কেন?"

"তুই ছাড়া আমার আর কে আছে! নিজের ছেলে থেকেও নেই। ছেলে নিজে যদি না বুঝে, আমি তাকে কী বলতে পারি! আর তোর মা'ও একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ।"

"তাই বলে তুমি কিছুই বলবে না?"

"নাহ। মানুষ তার নিজের কাজের জন্য নিজেই দায়ী থাকে। সেটা প্রতিটা মানুষকেই বুঝতে হবে। আমি কাউকে কিছু বলাটা পছন্দ করি না। আমি তোকে কি কোনদিন কিছু বলেছি?"

"নাহ বলোনি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বলাটা দরকার।" তৃণার গলা শক্ত হয়ে আসে।

দাদী সেই শান্তভাবেই বললেন, "কেন তোর এমন মনে হচ্ছে?"

তৃণা মাটির দিকে তাকিয়ে বললো, "আমার ধারনা, আমরা এখনও যথেষ্ঠ সভ্য হইনি।"

দাদী তৃণার মাথায় হাত রেখে বললেন, "জোর খাটালেই বুঝি আমরা সভ্য হয়ে যাবো? সেটাও কি আরেক ধরনের অসভ্যতা নয়?"

তৃণা মাথা নাড়িয়ে বললো, "হুম, হয়তো তাই। কিন্তু তোমার উপর যে মানসিক অত্যাচার হচ্ছে, সেটা আমি সহ্য করতে পারছি না, দাদী। আমাকে তুমি বলে দাও আমি কী করবো!"

তৃণার কপালে চুমু দিয়ে দাদী বললেন, "তুই আকাশের মতো বড় হবি। তুই মাটির মতো ধরিত্রী হবি। তুই বৃষ্টির মতো বিশুদ্ধ হবি। তুই প্রকৃতির সমস্ত সৃষ্টিকে ভালোবাসবি। মানুষের ক্ষুদ্রতা যেন তোকে ছুয়ে না যায় কখনও।"

দাদীর কথায় চোখে পানি চলে আসে তৃণার। দাদীর হাতটা শক্ত করে ধরে বললো, "কিন্তু আমি যে আজকেই একটা পাপ করে ফেললাম!"

"তুই কোনও পাপ করিসনি।"

খুব অবাক হয়ে তৃণা বললো, "কাগজের বই পড়া কি পাপ নয়!"

দাদী তৃণার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "কাগজের বই পড়াটা অপরাধ নয়। বই ছাপানোটা অপরাধ।"

তৃণা একটু অবাক হয়ে বললো, "কিন্তু দাদী, কয়েকশ বছর ধরেই তো এই আইন আছে যে, বই ছাপানো ও সংগ্রহ করা অপরাধ।"

"কিন্তু তুই তো এই বই ছাপাসনি। আর আইনের সরাসরি অর্থ করলে হয়তো তোর সংগ্রহে বই আছে। কিন্তু আইনটির উদ্দেশ্য তো সেটা নয়। আইনটি কেন তৈরী করা হয়েছিল তুই জানিস নিশ্চই?"

"হুম জানি। সেই বড় বিপর্যয়ের পর থেকেই তো এই আইনটি তৈরী করা হলো।"

"ঠিকই বলেছিস। চল আমরা চট করে একটু কিছু খেয়ে নেই। তারপর আমার ঘরে বসে শান্তি মতো বইগুলো দেখি।"

তৃণা বই নিয়ে আর কথা বাড়ালো না। খাবার গরম করতে লেগে গেল। দাদী আজকে নতুন চালের খিচুড়ি রান্না করেছেন। আর সাথে বেশি করে পেয়াজ দিয়ে ভাজা সমুদ্রের রূপচাঁদা মাছ। এটাই অবশ্য বেশির ভাগ দিনের খাবার। তবে আজকে বাড়তি ছোট তিমি মাছের ঝোল আছে। একটু বেশি ঝাল দিয়ে রান্না করেছেন দাদী। তখন অবশ্য তৃণাও দাদীকে রান্নায় সাহায্য করেছিল। দাদী হালকা করে রেডিওটা ছেড়ে দিয়ে এসে খেতে বসলেন। তৃণা রূপচাঁদা দিয়ে খিচুড়ি মুখে দিয়ে বললো, "দাদী, খুবই মজা হয়েছে। এই খাবার রেখে কিসের তোমার জামিলের জন্মদিনের পার্টি!"

হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টানোতে দাদী হেসে দিয়ে বললেন, "কিরে, তোর বুঝি জামিলকে পছন্দ নয়?"

তৃণাও হেসে দিয়ে বললো, "আর জামিল! ও তো একটা বনিক। সারাক্ষণ শুধু টাকা আর টাকা। একটা দিন তো লাইব্রেরীতে যায় না। কোনদিন গান শুনতে দেখিনি। এমন হালকা টাইপের ছেলে আমার মোটেও পছন্দ নয়, দাদী।"

দাদী মুখের খাবারটুকু শেষ করে হো হো করে হেসে দিলেন। তারপর বললেন, "তোর খালি পাকা পাকা কথা। কিন্তু ছেলেটা তো দেখতে বেশ!"

তৃণাও কম যায় না। দাদীর সাথে পাল্লা দিয়ে বললো, "তা যা বলেছো। শুধু মাকাল ফল, এই আর কি।"

দাদী টিপ্পনি কেটে বললেন, "আচ্ছা, তোর রাজকুমার আসার দিন পর্যন্ত যেন আমি বেঁচে থাকি।"

তৃণা মুচকি হাসি ধরে রেখে বললো, "ঠিক আছে। আমি তাহলে ওইটা একটু পিছিয়ে দেবো। তাহলে তুমি বেশিদিন বাঁচতে পারবে।"

সমুদ্রের পাড়ে ছোট এই গ্রাম। মানুষ জনের চলাচল এমনিতেই কম; সন্ধ্যার পর সব কিছু খুব শান্ত হয়ে আসে। রাতের খাবার খেয়ে টেবিল গুছাতে বেশ রাত হয়ে গেলো। দাদীর ঘরের বিছানায় যখন প্যাকেটটি নিয়ে ওরা বসেছে তখন পাশের কোনও একটি গাছে অচেনা একটা পাখি শব্দ করে ডাকছিল। রাতের নিরবতা ভেঙ্গে সেই শব্দ এসে পড়ছিল দাদীর ঘরেও।

দাদী প্যাকেট থেকে একে একে তিনটি বই বের করলেন। প্রথমেই বইগুলো নাকের কাছে নিয়ে ঘ্রান নিলেন। বইগুলো না খুলেই খুব ভালো করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। তৃণা হা হয়ে তাকিয়ে আছে বইগুলোর দিকে। হাত দিয়ে ধরতে ভয় পাচ্ছে। দাদী একটা বই তৃণার হাতে দিয়ে বললেন, "তুই তো আগে কখনও কাগজের বই ছুয়ে দেখিসনি। ভালো করে ছুয়ে দেখ। বইগুলো এখনো কত তাজা দেখেছিস?"

তৃণার স্কুলে লাইব্রেরী আছে। কিন্তু সেখানে কোনও ছাপার বই নেই। সব ডিজিটাল বই। সেগুলো পড়তে হয় কমপিউটারের পর্দায়, নয়তো কাচের প্রজেক্টরে কিংবা ক্যাভরীতে। সেখানে হাতে নিয়ে দেখার মতো কোনও ব্যাপার নেই। কোনও তথ্য বা ক্লাসের জন্য কিছু প্রয়োজন হলে, সার্চ করলেই সেটা চলে আসে। সবকিছুই থাকে কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে। বই ছাপানো বন্ধ হয়ে গেছে সেই বিপর্যয়ের পর থেকেই। তারপর যে সকল বই ছিল, সেগুলোকেও ডিজিটাল করে পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, যেন বই নিয়ে মানুষ আর কিছু করতে না পারে। তারপর আইন করে দেয়া হয়েছে, বই ছাপানো ও ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করা কঠিন অপরাধ। এবং সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদন্ড। পরবর্তিতে এমনভাবে প্রচারনা চালানো হয়েছে যে, সেটা সামাজিকভাবেও খুব ঘৃন্য একটা অপরাধ। তৃণা কাঁপা কাঁপা হাতে একটি বই ধরলো। মলাটটি উল্টে ভেতরটা দেখলো। তারপর কয়েকটা পৃষ্ঠা উল্টে বললো, "দাদী,

আমার যেন কেমন লাগছে। মনে হচ্ছে ভালো লাগায় পাগল হয়ে যাবো। এতো সুন্দর বই দাদী! বই এতো সুন্দর হয়!”

দাদী একটার পর একটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি পৃষ্ঠা গভীর মমতা দিয়ে ছুয়ে ছুয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি ছাপার অক্ষরকে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখছেন তিনি। চোখ না সরিয়ে বললেন, “বই আসলেই অনেক সুন্দর। দেখেছিস কিভাবে ছবি একেছে! একটা পৃষ্ঠায় কিভাবে যত্ন করে সাজিয়েছে, একেকটি পৃষ্ঠা যেন এককটি শিল্পকর্ম। ছুয়ে থাকতেই কত আনন্দ। বিপর্যয়ের সময় কেউ হয়তো এই বইগুলো নষ্ট করতে চায়নি। তাই এভাবে মাটির নিচে পুতে রেখেছিল।”

তৃণা দাদীকে জিজ্ঞেস করলো, “তুমি সর্বশেষ বই কবে দেখেছো দাদী?”

দাদী একটু চিন্তা করে বললেন, “সে তো সেই কলেজ জীবনে। একবার সবাই মিলে কেন্দ্রীয় যাদুঘরে গিয়েছিলাম। ওখানে কিছু সত্যিকারের কাগজের বই রাখা ছিল। তারপর আর বই পাবো কোথায়? যা দেখি তাতো এই টেলিভিশনে, নইলে তো ডিজিটাল লাইব্রেরীতে আর এই ক্যাভরীতে।”

তৃণা দাদীর টেবিলে রাখা ক্যাভরীটার দিকে তাকাল। ক্যাভরী হলো ডিজিটাল বই। সামনের পর্দাটি বইয়ের আকারের মতোই ছোট। ওটা এতোই পাতলা যে, ইচ্ছে মতো ভাজও করা যায়। ওটা চলে সূর্য্যের আলোতে। কোনও বই পড়তে ইচ্ছে করলে লাইব্রেরীতে গিয়ে সেই বইটা এই ক্যাভরীতে লোড করে নিলেই হলো। আজকাল সবসময় হয়তো লাইব্রেরীতেও যেতে হয় না। ঘরে বসে নেটওয়ার্ক থেকেও ডাউনলোড করা যায়। তারপর সেই ক্যাভরীতেই সবকিছু পড়তে হয়। তৃণারও এমন একটি আছে। এটাই এখন নিয়ম। তৃণা দাদীকে আবার জিজ্ঞেস করলো, “আচ্ছা দাদী, তুমি কি ঠিক জানো কেন ক্যাভরী আবিষ্কার করা হয়েছিল? আমার তো শুয়ে শুয়েই বই পড়তে খুব মজা লাগবে বলে মনে হচ্ছে।”

দাদী ওদিকে একটি বই পড়তে শুরু করে দিয়েছেন। তিনি তৃণার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বললেন, “চল, আমরা বইগুলো পড়ে ফেলি।”

তৃণা বললো, “ভালো বলেছো। আচ্ছা, বইগুলো পড়া হয়ে গেলে কি আমরা সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসবো? কেউ যদি জানতে পায় আমাদের কাছে বই আছে, তাহলে তো ভীষন বিপদ হয়ে যাবে।”

দাদী তৃণাকে আশ্বস্ত করে বললেন, “এগুলো ভালো করে লুকিয়ে রাখতে হবে। তুই আমার ঘরে এসেই রাতের বেলা বইগুলো পড়ে যাস। তোর মা তো আর আমার ঘরে খুব একটা আসবে না। বইগুলো পড়া হয়ে গেলে তারপর একটা বুদ্ধি বের করা যাবে।”

তৃণা আর প্রশ্ন করলো না। দাদীর পাশে শুয়ে বই পড়তে শুরু করলো।

চৌদ্দ দিন হয়ে গেলো, তবুও বইগুলো পড়া শেষ হলো না। প্রতিদিন বই পড়াও হয়ে উঠে না। মা-বাবা বাসায় থাকেন। তারা যদি টের পেয়ে যান, তাহলে মহাবিপদ হবে। তাই লুকিয়ে লুকিয়ে একটু একটু করে পড়তে হয়। সেটাও সেই রাতের বেলা, দাদীর সাথে। মাঝে মাঝে ভেবেছিল, তৃণা যখন স্কুল থেকে ফেরার পথে ক্ষেতে কাজ করতে যায়, তখন ওখানে গিয়ে পড়বে। কিন্তু সেই ঝুকি সে নেয়নি। দাদী নিষেধ করে দিয়েছিলেন। এভাবে মাত্র একটা বইয়ের প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছে। তৃণার অবশ্য তাড়াও নেই। শুধু মনে এক ধরনের ভয় কাজ করছে। এবং একদিন সেই ভয়টা সত্যিতে পরিনত হলো।

রাত তখন এগারোটা। তৃণা আর দাদী দুজন মিলে তখনও বই পড়ছিলেন। পাশের ঘরে তৃণার মা-বাবা। পুলিশ এসে ওদের সারা বাড়ি ঘিরে ফেললো। তৃণাদের বাড়ির চারদিকে বিভিন্ন করমের ফলের গাছ। আর সেগুলোকে চারদিকে ঘিরে আছে নারকেল গাছের সারি। সেই নারকেল গাছের পাশাপাশি এখন দাড়িয়ে আছে অসংখ্য পুলিশ। তাদেরকেও নারকেল গাছের অংশ মনে হচ্ছিল। চারজন পুলিশ বাড়ির ভেতরে এসে কড়া নাড়লো। এতো রাতে দরজায় কড়া পড়তেই দাদীর একটু সন্দেহ হলো। চট করে ঘরের আলোটি নিভিয়ে দিয়ে বললেন, “তুই ঘুমের ভান করে থাক। আমি দেখছি।”

তৃণা দাদীর কথা মতো কাঁথার নীচে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লো। কিছুক্ষনের জন্য দাদী যেন কোথায় চলে গেলেন। মুহূর্তের মধ্যেই ফিরে এসে শুয়ে পড়লেন তৃণার পাশে।

আর ওদিকে তখনও পুলিশ দরজায় শব্দ করে বলে যাচ্ছে, “পুলিশ, দরজা খুলুন।”

ঘুম ঘুম চোখে তৃণার বাবা গিয়ে দরজা খুলে দিল।

একজন পুলিশ অফিসার টর্চ লাইট মারতে মারতে ঘরের ভেতর ঢুকে বললো, “আমাদের কাছে গোপন তথ্য আছে। তোমার বাড়িতে কিছু কাগজের বই আছে।”

কায়েস চোখ চুলকাতে চুলকাতে বললো, “কাগজের বই! কি সব বলছো তোমরা। আমাদের বাসায় শুধু ক্যাভরী আছে। কাগজের বই তো আমি সারা জীবনেও চোখে দেখিনি।”

পেছন থেকে আরেকজন অফিসার বললো, “আমরা তোমার বাড়ি তল্লাশি করতে চাই।”

কায়েস উত্তর দিল, “যাও করো।” তারপর বিরবির করতে করতে বললো, “তোমরা এতো রাতে এসেছো মজা করতে। রাষ্ট্রের পয়সা নষ্ট।”

পেছনের তিনজন পুলিশ হুড়মুড় করে বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলো। প্রথম অফিসারটি বাইরের ঘরের চারদিকে তাকাচ্ছিল। কায়েস তাকে বসতে বলে নিজে বেশ বড় একটা হাই তুললো।

পুলিশ অফিসার বসতে বসতে বললো, “তোমাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটানোর জন্য দুঃখিত। বুঝতেই পারছো, আমরা তো রাষ্ট্রের কর্মচারী। আমাদেরকে যা বলা হবে, আমরা তাই করবো।”

কায়েস আবারো হাই তুলে বললো, “করো। বই যদি পাও, তাহলে তো ভালো। এই সুবাদে আমি নিজের চোখে বইটা দেখে নিব। ভালো কথা, তুমি নিজে কি কখনও কোনও কাগজের বই দেখেছো?”

পুলিশ অফিসার মাথা নেড়ে বললো, "নাহ, কিভাবে দেখবো! কয়েক শত বছর ধরে তো সেগুলোর অস্তিত্ব লোপ পেয়েছে।"

কায়েস এবারে একটু গলা পরিষ্কার করে বললো, "বলো যে লোপ পায়নি, বিলুপ্ত করা হয়েছে।"

পুলিশ অফিসার একটু হেসে দিয়ে বললো, "তোমার সাথে এতো রাতে কোনও বিতর্কে যাবো না। এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা হলেই আমরা খুশি।"

একটু পর পুলিশ অফিসার তিনজন ফিরে এসে বললো, "সরি স্যার। পুরো বাড়ি তো তন্ন তন্ন করে খুঁজে ফেললাম। আমাদের বই ডিটেক্টর মেশিনও ব্যবহার করলাম। কোথাও তো কোন বইয়ের ছিটেফুটাও পাওয়া গেলো না।"

পুলিশ অফিসার একটু বিরক্ত হয়ে বললো, "ঠিক আছে, চলো।" তারপর কায়েসের সাথে হাত মিলিয়ে বললো, "সরি। তোমাদেরকে এতো রাতে বিরক্ত করার জন্য। চলি। শুভ রাত্রি।"

কায়েস কোনও কথা না বলে দরজা লাগিয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

তৃণা দাদীকে চুপি চুপি বললো, "এটা কি হলো? ওদের হাতে তো বই ডিটেক্টর ছিল। বইগুলো পেলো না কেন?"

দাদীও খুব আস্তে আস্তে বললেন, "মাটির আবরনে বই ডিটেক্টর কাজ করে না।"

তৃণা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি বইগুলো মাটির নীচে রেখে এসেছো?"

দাদী মুচকি হেসে বললেন, "অনেকটা তেমনি। এখন ঘুমিয়ে পড়। মনে হচ্ছে ওরা কোনওভাবে কিছু একটা টের পেয়েছে। পুরো পরিকল্পনা কালকে করা যাবে।"

তৃণা আর কথা বাড়ালো না। দাদীকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়লো।

মাস দেড়েক পরেই শুরু হলো ফসল কাটার বিশাল উৎসব। বাড়ির পেছনেই তৃণার দাদীর বিশাল ক্ষেত। ওখানে কৃষিকাজ হয়। তার জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লোক এসে কাজ করে দিয়ে যায়। কখনও অবশ্য সরকারী অফিস থেকে বীজ দেয়ার কিংবা আবর্জনা পরিষ্কার করার যন্ত্রও আনতে হয়। ওই সময়টা তৃণা খুব উপভোগ করে। সে ওই যন্ত্রের উপর গিয়ে বসবে। মাঝে মাঝে চালানোরও চেষ্টা করবে। কিন্তু তাকে এখনও সেটা করতে দেয়া হয় না। তবুও চালকের পাশে বসে পুরো ক্ষেতটা ঘুরে বেড়াতে ওর খুব ভালো লাগে। মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলবে, "হৈ হৈ।" তবে তৃণার সবচে বড় আনন্দ হলো যখন ফসল কাটা হয়। সেটা হোক ধান, নয়তো গম কিংবা আলু। এগুলো করার জন্যও যন্ত্র আছে। কিন্তু দাদী তখন যন্ত্র আনতে দেন না। তখন চারপাশের এলাকা থেকে লোকজন জড় করা হয়। তারাই ফসল তুলবে। বাড়ির উঠোনে ফসল মারাই হবে। আর আরেক পাশে হবে বিশাল রান্নার আয়োজন। সমস্ত মানুষ তখন পালা করে খাবে আর ফসল মারাই করবে। এবারো তাই হচ্ছে। দাদী উঠোনে একটা চেয়ারে বসে দেখভাল করছেন। আর সোহানা সামলাচ্ছে সমস্ত কর্মকান্ড - কোনটা কোথায় রাখবে, কোথায় সিদ্ধ হবে, আর কোনটা রান্না হবে। এই একটা সময় সোহানা তার শ্বাশুড়িকে কষ্ট দেয় না। মন থাকে ফুরফুরে। পুরো ফসল ঘরে উঠলেই নতুন দিনের শুরু। সোহানা সেই স্বপ্নে বিভোর থাকে।

তৃণার ওর বাবার সাথে ক্ষেত থেকে উঠোনে ফিরলো। দাদীকে চেয়ারে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলো, "দাদী, তুমি তো যন্ত্র দিয়ে মারাই করালেই পারো। কেন এতো লোকজনকে ডেকে নিয়ে আসো! কত ঝামেলা হয়, তাই না?"

দাদী হেসে দিয়ে বললেন, "কারো কাছে ঝামেলা, আর করো কাছে উৎসব। তোর ব্রেইনকে যেটা তুই শিখাবি, ব্রেইন সেভাবেই চিনবে।"

"মানে কি, খুলে বলো।"

"মানে খুব সোজা। তুই তোর ব্রেইনকে বলতে চাইছিস এগুলো ঝামেলার কাজ। তাই তোর ব্রেইনও তোকে সেটাই ভাবতে দিচ্ছে। কিন্তু তুই যদি ভাবতে শুরু করিস, এটা একটা উৎসব, দেখবি তুই নিজেও সেটা উপভোগ করছিস।"

"ওমা, আমি কি বলেছি নাকি যে আমি উপভোগ করি না! আমি তো এটাকেই সবচে বেশি উপভোগ করি। আমি প্রতিদিন ক্ষেতে যাই, আর ভাবি, ইস কবে ওরা ফল দেবে। আর আমাদের বাড়িতে উৎসব শুরু হবে। তুমি দেখো না, আমি কেমন কেমন সব গীত গাইতে শুরু করি। তোমার বুঝি আজকাল এগুলো নজরে পড়ে না!" অভিমান করলো তৃণা।

দাদী আরো হাসতে হাসতে বললেন, "সে কথাই তো বলছি। তুই গীত গাইছিস না কেন!"

তৃণা ঠোট বাকিয়ে বললো, "গাইবো। কিন্তু তার আগে তুমি বলো, কেন তুমি এত্তোগুলো পয়সা খরচ করে সবসময় এমন উৎসব করো?"

"যদি বলি তোর জন্য তুই কি সেটা বিশ্বাস করবি?"

"আচ্ছা, আমি তোমার কোন কথাটা বিশ্বাস করি না বলো?"

বাড়ির ভেতর থেকে একজন এসে দাদীকে একটা মগে চা দিয়ে গেলো। দাদী সেই চা'তে চুমুক দিয়ে বললেন, "তাহলে তোর জন্যই করি। হয়েছে এবার?"

তৃণা দাদীর কোলে এসে মাথা রেখে বললো, "শুধু আমার জন্য না। আরো কোনও কারন আছে। তুমি সেটা আমাকে বলছো না।"

দাদী খুব মায়া করে বললেন, "হুম, কারন আছে। তুই কি পড়িসনি, কেন আমাদের মহাবিপর্যয় হয়েছিল। মানুষ হয়ে গিয়েছিল খুব স্বার্থপর। নিজেরটা ছাড়া আর কিছুই বুঝতো না। সামাজিক সব কিছু তখন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মানুষ বুঝতে পারেনি, আমরা সবাই যদি শুধু নিজের ভালো দেখি, তাহলে সবাই মিলে কিভাবে ভালো থাকতে হয়, সেটা আমরা ভুলে যাই। ফলে যারা কিছু পাচ্ছে না, তারা প্রকৃতির উপর অত্যাচার শুরু করে। তারপর প্রকৃতিও আর সেটা সহ্য করে না। এটাই তো নিয়ম। এই যে সারা গ্রামের মানুষগুলো আনন্দ করছে, তোর এটা দেখতে ভালো লাগছে না?"

দাদীর কথায় তৃণা একটু গম্ভীর হয়ে গেলো। সে কখনও এভাবে ভাবেনি।

দাদী বুঝতে পারলেন, তৃণা কিছু একটা ভাবছে। বললেন, “তুই একটা গীত ধর তো দেখি।”

তৃণা আর কোনও কথা না বলে, গান গাইতে শুরু করলো। ”এসো ধরি হাত, হাতে রাখি হাত, এই জীবন করি মঙ্গল..”। পুরো উঠোনে সবাই ব্যস্ত। তৃণার গান শুনে সবাই এক মুহূর্ত ওর দিকে তাকালো। আর বাচ্চাগুলো তাদের দৌড়াদৌড়ি বন্ধ করে তৃণার সামনে এসে দাড়ালো। দাদী সবাইকে হাত নেড়ে বসতে বললেন। বাচ্চাগুলো মাটিতেই বসে গেলো। আর তৃণা খোলা গলায় গাইতে থাকলো - “ভালোবাসো জীবন, ভালোবাসো প্রকৃতি, আর ভালোবাসো প্রকৃতির সন্তান।”

তৃণা একটার পর একটা গান গেয়ে যাচ্ছিল। সামনে কিছু বাচ্চা সেই গানের সাথে নাচানাচিও শুরু করলো। এখন তৃণা আট নম্বর গান গাইছে। তখুনি সবাই খেয়াল করলো, বাড়িটিকে আবার পুলিশ ঘিরে ফেলেছে। মুহূর্তের ভেতর কিভাবে এতো পুলিশ এলো কেউ বুঝতে পারলো না। আজকে আরেকজন অফিসার এসেছে। সে দাদীর সামনে এসে বললো, “তৃণাকে আমাদের সাথে যেতে হবে।”

দাদী কঠিন গলায় বললেন, “কেন?”

পুলিশ অফিসারটি শান্ত ভাবেই বললো, “তৃণার কাছে কাগজের বই আছে।”

এটা শুনে পুরো উঠনো একটা ফিসফিস শব্দ ছড়িয়ে পড়লো। দাদী ক্ষেপে গিয়ে বললেন, “তোমরা বার বার একি কথা বলছো। কিন্তু তোমাদের কাছে কোনও প্রমাণ নেই। আমাদের তোমরা আর কত বিরক্ত করবে? গত দুই মাসে তো এই নিয়ে পাঁচবার আমাদেরকে যন্ত্রনা দিলে।”

পুলিশ অফিসারটি বললো, “এবারে আমাদের কাছে প্রমাণ আছে।”

দাদী বললেন, “দেখাও আমাকে সেই প্রমাণ। নাগরীক হিসাবে আমার সেটা জানার অধিকার আছে।”

পুলিশ অফিসারটি বিনয়ের সাথে বললো, “জ্বী অবশ্যই আপনার সেই অধিকার আছে। তবে শুনুন, তৃণা যে গানগুলো গাইছে, তার কয়েকটা আমরা আগে কেউ শুনিনি। আমাদের লাইব্রেরীতেও নেই। আমরা নিশ্চিত, তৃণা এগুলো ওই বই থেকে শিখেছে।”

দাদী এটা খেয়াল করেননি। বললেন,“তৃণা তো নিজ থেকেও গান রচনা করতে পারে, তাই না?”

পুলিশ অফিসার বললেন, “তৃণার ভেতর তেমন গুণ থাকতেই পারে। কিন্তু তৃণাকে আমরা আগে কখনও এমন কিছু করতে দেখিনি।”

দাদী কঠিনভাবেই বললেন, “আগে কেউ করেনি বলে এখন করবে না, তাতো নয়। মানুষ তো কবি হতেই পারে। মানুষই তো কবি হয়, নাকি?”

পুলিশ অফিসার আরো বিনয়ের সাথে বললো, “জ্বী হয়। কবিদেরকে আমরা সন্মান করি। তৃণা যদি কবি হয়, তাহলে ওর কবিতা আমরা সমস্ত লাইব্রেরীতে রাখবো। সবাই সেটা ডাউনলোড করে পড়বে। কেউ কেউ গীত গাইবে। কিন্তু আমরা বলছি, ওর কাছে ছাপানো বই আছে। আমাদের সাথে ওকে যেতে হবে। আমরা কোর্টের আদেশ নিয়ে এসেছি।”

কোর্টের আদেশ অমান্য করা যাবে না। দাদী আর কিছু বললেন না।

পুলিশ তৃণাকে নিয়ে গেলো। পুরো বাড়িতে নেমে এলো একটা কালো ছায়া।

তৃণার বিচার শুরু হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, ব্যক্তিগতভাবে বই সংগ্রহের। রাষ্ট্রের আইন কোনও নাগরিককে ছাপার বই প্রকাশ ও সংগ্রহকে অনুমোদন করে না। সরকারী পক্ষের আইনজীবি রইস আহমেদ খুব কড়া ভাষায় এর সমালোচনা করে বিজ্ঞ আদালত ও জুরীদেরকে বলেছেন, “এই শতাব্দিতে এর থেকে ঘৃন্য কাজ আর কেউ করেনি।” তিনি আদালতে বিশাল লম্বা বক্তব্য রাখলেন। তিনি এক সময় উত্তেজিত হয়ে বলতে থাকেন, “এই ধরনের ঘৃন্য মানুষকে সমাজ থেকে দূরে রাখাই শ্রেয় হবে মহামান্য আদালত। এদের জন্যই পৃথিবী নামক এই গ্রহের এমন বিপর্যয় নেমে এসেছিল। মহামান্য আদালতের কাছে আমি আর্জি জানাচ্ছি, এই অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদন্ড দেয়া হোক। তাতে করে আর কখনও কেউ এমন অন্যায় করার সাহস পাবে না।”

রইস সাহেবের এই কথায় কোর্টের ভেতর জোরে হাততালি পড়লো। তৃণার দাদী বসে ছিলেন দর্শকদের সাড়িতে। তিনি উত্তেজিত হয়ে দাড়িয়ে পড়লেন। মাটিতে লাঠি ঠুকে বললেন, “এই অন্যায়, এটা অন্যায়।”

বিজ্ঞ বিচারক তার টেবিলে হাতুড়ি পিটিয়ে বললেন, “অর্ডার, অর্ডার। আমাদের আইনে সবার অধিকার সমান করা হয়েছে। আরো নিশ্চিত করা হয়েছে, যেন রাষ্ট্রের ছায়ায় কোনও ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া না হয়। রাষ্ট্র কারো একক সম্পত্তি নয়। আমাদের রাষ্ট্রের উপর সবার অধিকার সমান। তাই আপনার যদি কিছু বলার থাকলে মঞ্চে এসে কথা বলুন।”

বিচারকের প্রতি সন্মান জানিয়ে তৃণার দাদী মঞ্চে এসে দাড়ালেন। তারপর শাড়ির আচল দিয়ে চশমাটার কাঁচটি পরিষ্কার করে বলতে শুরু করেন, “মহামান্য আদালত, আমাদেরকে আজকে ভালো করে বুঝতে হবে, কেন এমন একটি আইন তৈরী করা হয়েছিল। সে সম্পর্কে পরিস্কার ধারনা না থাকলে, আমাদের ভুল করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে।”

বিচারক তৃণার দাদীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনি আমাদেরকে অবহিত করুন। আমরা এখুনি কোনও সিদ্ধান্ত নিচ্ছি না।”

তৃণার দাদী একটু লম্বা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, “সে এক লম্বা ইতিহাস। আজ থেকে দুই শত সতেরো বছর আগের কথা। যখন এই গ্রহে ঘটেছিল এক মহাবিপর্যয়। সেটা ছিল প্রাকৃতিক বিপর্যয়। প্রকৃতির উপর তখনকার মানুষের অত্যাচার প্রকৃতি সহ্য করেনি। তখনকার মানুষ এমন বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে, তারা সমস্ত গাছ কেটে কাগজ বানাতে শুরু করলো। তখন সভ্যতা যত বাড়তে থাকলো, মানুষ ততই গাছ কাটতে শুরু করলো।

মানুষ জ্বালানীর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সূর্য্যের আলোকে তারা ব্যবহার করতে শুরু করলো ঠিকই..” । দাদী এখানে একটু থেমে আবার বলতে শুরু করেন, “আমরাও আজকে তাদের বংশধর হয়ে সূর্য্যকে ব্যবহার করছি। কিন্তু তারা জ্বালানী সমস্যার সমাধান করতেই সমস্ত ক্ষমতা ব্যয় করেছিল। তারা কাগজের কোনও বিকল্প তৈরী করেনি। ফলে গাছ কাটা থেমে থাকেনি। তারপর সেটা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছালো যে, প্রকৃতি আর সহ্য করতে পারলো না। প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেললো। পুরো পৃথিবীতে নেমে এলো বিপর্যয়। সব কিছু ধুয়ে মুছে গেলো। আমরা যারা বেঁচে থাকলাম তারা সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিলাম কাগজের উপর। তারপর থেকে আইন করে বন্ধ করে দেয়া হলো কাগজ তৈরী। নিষিদ্ধ হলো খবরের কাগজ, বই সহ যাবতীয় প্রকাশনা।”

এই পর্যন্ত বলে দাদী থামলেন। ঘরের সবাই মুগ্ধ হয়ে তার কথা শুনছে। এতোটুকু শব্দ নেই কোথাও। বাইরে গাছের পাতার যে মরমর শব্দ হচ্ছে, সেটাও ঘরের ভেতর এসে পড়েছ। দাদী একটু পানি খেলেন। তারপর আবারো বললেন, “মাননীয় আদালত, আমাদের পূর্বপূরুষেরা মানব প্রজাতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করলেন, আলোর বই তৈরী করতে। প্রথমে তারা বানালেন ইলেক্ট্রনিক বই। তাতেও খুব একটা লাভ হলো না; কারন তাতে বিদ্যুতের উপর চাপ পড়ছিল। তারপর তৈরী হলো আলোর বই ক্যাভরী। সূর্যের আলোতে চলে এই বইগুলো। মানব প্রজাতি বেঁচে গেলো। আর পুরনো যত লাইব্রেরী ছিল, সেগুলোকেও রূপান্তরিত করা হলো আলোর লাইব্রেরীতে। তারপর থেকেই এই গ্রহে বই ছাপানো নিষিদ্ধ। আর সেই আইনকে রক্ষা করার জন্য কাগজের বই সংগ্রহ করাটাও নিষিদ্ধ করা হলো।”

দাদী এখানে আবারো একটু থামলেন। ঘরের ভেতর একটু গুনগুন শুরু হলো। কোর্টের ভেতর লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে। তাই একটু গরমও লাগছে। দাদী শাড়ির আচল দিয়ে মুখটা মুছলেন। তারপর টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে আবার পানি খেলেন। গলা পরিষ্কার করে দাদী আবার বলতে শুরু করলেন, “মাননীয় আদালত, আমি আইনজীবি নই। আমি আইনের ভাষা বুঝি না। আইনের ফাঁক ফোকরও বুঝি না। আমি শুধু এটুকু বুঝি, আইন কখনও মানুষের অমঙ্গলের জন্য হতে পারে না। আইন মানুষের কল্যানের জন্য, আইন মানুষের শুভবুদ্ধির জন্য। আইন আমাদেরকে আরো সভ্য করার জন্য। আমরা কেউ কেউ আইনকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করি বলেই আইনকে এতো জটিল করা হয়েছে। আর এর জন্য দায়ী হলো সকল আইন ব্যবসায়ীরা। তারা তাদের স্বার্থকে ঠিক রাখার জন্য আমাদের নিরীহ মানুষের উপর এভাবে আইনের অপপ্রোয়োগ করে থাকেন। তৃণা কোনও অন্যায় করেনি। তৃণা নিজের ইচ্ছায় বই সংগ্রহ করতে যায়নি। সাগরের তীরে মাটি খুড়তে গিয়ে পেয়েছিল। আর সেগুলো সে বাসায় নিয়ে এসেছিল।”

এবারে সরকার পক্ষের উকিল উঠে দাড়ালেন। চিৎকার করে বললেন, “গ্রহের আইন অনুযায়ী সেগুলোকে রাষ্ট্রের কাছে জমা দেয়ার কথা। পুলিশকে খবর দেয়ার কথা। সেটা না করে, তৃণা বইগুলো বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। এটা অপরাধ।”

দাদী তখন কিছু একটা বলতে গেলেন। কিন্তু ততক্ষণে তৃণার উকিল মোখলেস উদ্দিন গলা চড়িয়ে বলতে থাকেন, “মহামান্য আদালত, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই, আমরা কেউ সেই বইগুলো দেখেছি কি না? যদি কেউ না দেখে থাকেন, তাহলে আপনার মাধ্যমে জুরীবৃন্দকে অনুরোধ জানাবো বইগুলো নিজ হাতে নিয়ে দেখার জন্য।”

বিচারক মাথা নেড়ে বললেন, তারা কখনও কেউ কাগজের বই দেখেননি। বইগুলো আদালতকে দেখানোর জন্য বিচারক নির্দেশ দিলেন।

কিছুক্ষনের মধ্যেই বই তিনটি আনা হলো। বইগুলো বিচারকের টেবিলে রাখা হলে, বিচারকের চোখ চিকচিক করে ওঠলো। তিনি বই তিনটি হাতে নিয়ে মুচকি হেসে দেন। তারপর পৃষ্ঠাগুলো হাত দিয়ে আদর করে উল্টে দেখেন। একটু ঘ্রানও শুকেন তিনি। তারপর বইগুলো জুরীদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য বাড়িয়ে দেন।

সাতজন জুরি। তিনটি বই। বইগুলো তাদের টেবিলে রাখার সাথে সাথে একটা টানাটানি পড়ে গেল। কেউ যেন আর অপেক্ষা করতে চাইছেন না। কেউ বইগুলো নিয়ে আর ছাড়তে চাইছেন না। সবার চোখ যেন জ্বলে উঠলো।

মোখলেস উকিল তখন বললেন, “এমন সুন্দর জিনিস মানুষ কিভাবে বাড়িতে নিয়ে আসবে না, সেটাই একটি বিশাল প্রশ্ন। মাননীয় জুরি, আপনারা নিজেদেরকে জিজ্ঞেস করুন, আপনার এমন সুন্দর ছাপানো বই পেলে কী করতেন?”

কেউ আর সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার প্রয়োজন মনে করলো না। সবাই বই নিয়ে টানাটানিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। দর্শকদের সাড়ি থেকে কেউ কেউ বলতে থাকলো, “আমরা সারা জীবনে একটা ছাপার বই দেখিনি, আমাদেরকেও বই দেখতে দাও।” কোর্ট ঘরে হৈ চৈ বাড়তে থাকে। অবস্থা সুবিধার মনে হলো না। বিচারক সেদিনের মতো বিচারকাজ স্থগিত করলেন।

পরের দিন আবার বিচার কাজ শুরু হলো। আজকের দর্শকের সংখ্যা আরো বেশি। দু'জন জুরি আসতে দেরি করেছেন বলে বিচার কাজ শুরু করা যাচ্ছিল না। কিন্তু এদিকে দর্শকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। পুরো ঘর ভর্তি হয়ে গিয়ে বারান্দায়ও চলে গিয়েছে। বুড়ো থেকে শুরু করে তরুন বয়সী মানুষ- সবাই এসে হাজির হয়েছে। তাদের বেশির ভাগেরই ইচ্ছে, যদি নিজের চোখে একটি কাগজের বই দেখতে পাওয়া যায়।

দর্শকের সংখ্যা বাড়ছে দেখে আদালতে পুলিশের সংখ্যাও বাড়ানো হলো। তারপর যখন বিচার কাজ শুরু হলো, তখন বই তিনটি আবার টেবিলের উপর রাখা হলো। আর সাথে সাথে দর্শকদের ভেতর শুরু হলো গুঞ্জন। দর্শকদের অনেকেই তাদের শিশুদের নিয়ে এসেছেন। তাদের কেউ কেউ শিশুদেরকে কোলে তুলে, কেউ ঘাড়ে তুলে বইগুলো দেখানোর চেষ্টা করছেন। ওদিকে মোখলেস উকিল কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু দর্শকদের সেদিকে নজর নেই। সবার দৃষ্টি বইগুলোর দিকে। পুরো কোর্ট ঘরে ফিসফিস শব্দ।

একটু পর কয়েকজন পুলিশ এসে বিচারকের পেছনে এসে দাড়ালো। একজন কানে কানে জিজ্ঞেস করলো, “স্যার, মানুষের আগ্রহ বেড়েই চলেছে। আপনি কি বিচার কাজ বিশেষ আদালতে করবেন নাকি?”

বিচারকের চোখ বড় হয়ে গেলো। ভ্রু কুচকে জানতে চাইলেন, “এটা আবার কেমন আদালত? এমন কিছু আছে বলে তো আমি জানি না!”

পুলিশ অফিসার বললেন, “স্যার, বিপর্যয়ের আগে এমন ইতিহাস আছে। আমরা পুলিশ দিয়ে সারা এলাকা বন্ধ করে দিব। আপনি নিশ্চিন্তে বিচার পরিচালনা করতে পারবেন। কাউকেই ঢুকতে দেয়া হবে না। নইলে স্যার, ঝামেলা হতে পারে।”

বিচারক একটু ভেবে দেখলেন, ব্যাপারটা মন্দ না। পুরো কোর্ট ভর্তি মানুষ। কেউ কথা শুনছে না। সবাই বই বই করছে। তার চেয়ে নিরিবিলি বিচার হলে মন্দ কি! তিনি টেবিলে হাতুড়ি পিটিয়ে সেদিনের মতো বিচার কাজ বন্ধ করে দিলেন। মানুষ হতাশ হয়ে কোর্ট ঘর ছেড়ে ধীরে ধীরে চলে গেলো।

চারদিন পর পুলিশ পাহাড়ায় বিশেষ আদালতে আবার বিচার শুরু হলো। আজ কোনও দর্শককে ঢুকতে দেয়া হয়নি। দর্শকরা দূরের দেয়ালের কাছে জড়ো হচ্ছে। তৃণাকে নিয়ে আইনজীবি আর জুরিরা বসেছেন। তবে তৃণার দাদী আর মা-বাবাকে থাকার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তারা বিশাল কোর্টঘরে এতিমের মতো বসে রইলেন।

তৃনার আইনজীবি বিচারকের অনুমতি নিয়ে বলতে শুরু করলেন, “মহামান্য আদালত, তৃণা একটি বৃদ্ধিমতি কিশোরী। লেখাপড়ায় সে সবসময় ভালো করে আসছে। লেখাপড়ায় রয়েছে তার বিশেষ ঝোক। পাশাপাশি রাষ্ট্রের অনেক স্বেচ্ছাসেবক কাজেও তার অবদান রয়েছে। একজন সুনাগরিক হিসেবে তার পরিচিতি রয়েছে। বইগুলো নেহায়ত পড়ার জন্যই সে বাড়িয়ে নিয়ে এসেছিল। জ্ঞানপিপাসু একজন কিশোরীকে মহামান্য আদালত এবং জুরিমন্ডলী ক্ষমাসুন্দর দৃস্টিতে দেখবেন বলেই আমরা আশা করি।”

তখন সরকার পক্ষের উকিল রইস সাহেব দাড়িয়ে বললেন, “এই ধরনের কাজের দৃষ্টান্ত মূলক শাস্তি না দিলে সমাজে এই অপরাধ প্রবণতা কমবে না। তাই আমি আবেদন জানাচ্ছি ... ”

রইস সাহেবের কথা শেষ হলো না। বাইওে ভীষণ হৈ হৈ শব্দ। দেয়ালের ওপারে চিৎকার চেচামেচি শুরু হয়েছে। সেখান থেকে স্লোগানের মতো শব্দ এলো, “এই পাতানো বিচার মানি না, মানবো না”, “রাষ্ট্রের নাগরিকের বিচার বদ্ধ ঘরে কেন, বিচার চাই”, “বিচারকের পদত্যাগ চাই..”, এমন আরো শব্দ আসতে শুরু করলো। সবাই দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ব্যাপারটা বুঝার চেষ্টা করলেন। তখন কিছু যুবক দেয়াল টপকে ঢুকে গেছে কোর্ট এলাকায়। ওরা দৌড়ে সামনে আসতে শুরু করলে, পুলিশ গুলি ছুড়লো। সাথে সাথে দু'জন যুবক মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। পরিস্থিতি একদম পাল্টে গেলো। কোর্ট এলাকায় জড়ো হতে থাকলো হাজার হাজার মানুষ।

গেটের সামনে কয়েক হাজার মানুষ। একজন দেয়ালের উপর দাড়িয়ে বক্তৃতা দেয়ার ভঙ্গিতে বলতে শুরু করলেন, “প্রিয় ভাইবোনেরা! এই দেশ আমাদের, এই মাটি আমাদের, এই কোর্ট বানিয়েছি আমরা, এই পুলিশকে বেতন দেই আমরা, রাষ্ট্রের মালিক আমরা; আর এই পুলিশ কি না আমাদেরকে গুলি করে হত্যা করছে! এত্তো সাহস ওরা পেলো কিভাবে? আর সবার আড়ালে এটা কোন ধরনের বিচার? এদের কর্মকান্ড তো বর্গীদের চেয়েও খারাপ। অন্য কারো বিচার করার আগে তো এদের বিচার হওয়া দরকার।”

হাজার হাজার মানুষ হৈ হৈ করে উঠলো। এই ভিড়ের ভেতর একজন চিৎকার করে বললো, “ওর এখুনি বিচার করা হোক।”

সেই কথার সাথে আছড়ে পড়লো হাজারো গলা, “ওদের বিচার হোক।”

পরিস্থিতি সামাল দিতে ততক্ষনে আরো পুলিশ চলে এসেছে। পুলিশের একজন উর্ধতন কর্মকর্তা মাইকে বললেন, “আপনার কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিবেন না। আমরা যথাযত বিচার করবো। আপনাদেরকে পুরো আশ্বাস দিচ্ছি।”

বেশ কয়েকবার এভাবে বলার পর মানুষ কিছুটা শান্ত হলো।

তৃণার বিচার কাজ পিছিয়ে গেলো। ছত্রিশ দিন পর বিশেষ আদালতে বিচারের রায় ঘোষণা করা হলো। সেই রায়ে বলা হলো, অপরাধীর বয়সের কথা চিন্তা করে ওর শাস্তি মৃত্যু দন্ড থেকে কমিয়ে সাত বছরের জন্য মঙ্গল গ্রহে পাঠানো হলো। ওখানে বসতির জন্য মানুষ প্রয়োজন। সে তার প্রায়শ্চিত্ত করুক। তারপর বিশুদ্ধ হয়ে ফিরে পৃথিবীর নিয়ম মেনে চলার পরামর্শ দেয়া হলো।

এই রায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে দাদী বললেন, “এ অন্যায়, এ অন্যায়।”

তারপর তারা কোর্ট ঘর থেকে বেড়িয়ে আসেন। তৃণার মা-বাবা বোকার মতো কাঁদতে থাকেন। কোথা দিয়ে কী হচ্ছে কিছুই যেন বুঝতে পারছেন না তারা।

শহরের একটু বাইরে নভোযাণ কেন্দ্র। তৃণার আজকে ফ্লাইট। সাথে যাচ্ছেন দাদী। দাদীর যাওয়া নিয়ে অনেক ঝামেলা হয়েছে। দাদী সরকারের কাছে বিশেষ অনুমতি নিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, “যে মানবকুল আক্ষরিক আইনের বাইরে আর কিছু দেখতে পায় না, যে গ্রহে বই পড়ার জন্য একটি কিশোরীকে শাস্তি দেয়া হয়, সে গ্রহে আমি থাকতে রাজী নই। আমি আমার যাবতীয় সম্পদ ত্যাগ করে তৃণার সাথে মঙ্গলে যেতে চাই।”

সরকার প্রথমে অনুমতি দিতে চায়নি। সেটা নিয়েও এলাকায় অসন্তোষ তৈরী হচ্ছিল। এলাকার অনেকেই অবশ্য দাদীকে বুঝাতে এসেছিলেন এই বলে যে, যে পুলিশ গুলি করেছিল তার তো ফাঁসির আদেশ হয়েছে; আর যে বিচারক রুদ্ধদ্বার বিচার করেছে, সে অপমানের গ্লানি নিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাহলে আর দাদীর এই সিদ্ধান্ত কেন! কিন্তু দাদী

সেকথায় কান দেননি। একদিন শুধু চিৎকার করে এলাকার নেতাকে বলেছিলেন, "যে দেশের মানুষ অন্যায়কে মেনে নেয়, যে দেশের মানুষের চেয়ে সরকার বড় হয়ে যায়, যে দেশে মানুষ ক্ষমতার সাথে নীতির আপোষ করে, সেই দেশে বিপর্যয় আসবেই। বার বার আসবে। তোমার জায়গায় আমি নেতা হলে, লজ্জায় অপমানে অপারাগতায় চৌরাস্তায় মঞ্চ করে সেখানে জনসন্মুখে আত্মহত্যা করতাম।"

নেতা কিছু বলেননি। মাথা নীচু করে ছিলেন।

তখন দাদী তাকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন, "তোমার সরকারকে বলো আমার মঙ্গলে যাওয়াও অনুমতি দিতে। নইলে যে কাজটি তুমি করতে পারোনি, সেটা আমি করে দেখাবো।"

দাদীর হুমকিতে কাজ হলো। ওরা অনুমতি দিয়ে দিলো। দাদী সঙ্গী হলেন তৃণার।

গেটের সামনে অনেক লোকজন। এলাকার অনেকেই এসেছেন বিদায় দিতে। তৃণা কারো সাথে কোনও কথা বলছে না। অস্বাভাবিক রকমের চুপ করে আছে। ওর মা-বাবা অবশ্য ভেউ ভেউ করে কেঁদে দিলো। তৃণা তাদেরকে জড়িয়ে ধরে আদর করলো। শাপের মতো শীতল সেই আদর।

তৃণা রোবটের মতো হেটে হেটে নিরাপত্তা গেট পাড় হয়ে গেলো। পেছনে দাদী। ওদের গায়ে বিশেষ ধরনের সাদা রঙের পোষাক। তবে মাথাটা এখনো খোলা। নভোযানে উঠলে মাথায় মাস্ক পড়িয়ে দেয়া হবে। ওরা হেটে গেট পার হয়ে লিফটের সামনে দাড়িয়ে আছে। সেটার লাল বাতি জ্বলছে আর নিভছে। আজকে এই গেট দিয়ে সতের জন যাবে। এগারো জন গেট দিয়ে ভেতরে চলে এসেছে। বাকীরা নিরাপত্তা এলাকায়।

এখন হলুদ বাতি জ্বলছে আর নিভছে।

সতের জন যাত্রী লিফট দিয়ে নীচে নেমে গেলো। তারপর মাটির তলা দিয়ে একটি টানেল। একটা মাইক্রোবাস ওদেরকে সেই টানেল দিয়ে নিয়ে এসেছে প্রধান ষ্টেশনে। বাস থেকে নামার সাথে সাথেই সবাইকে মাস্ক পড়তে দেয়া হচ্ছে। এরপর কথা বলতে অসুবিধা হবে। তৃণা দাদীকে একটু জড়িয়ে ধরে বললো, "ধন্যবাদ, দাদী।"

দাদী তৃণার কপালে চুমু দিয়ে বললেন, "আমাকে ধন্যবাদ কেন?"

মাস্কটা হাতে নিয়ে তৃণা বললো, "এই যে আমার সাথে যাওয়ার জন্য। নইলে আমার একা একা থাকতে হতো।"

মুচকি হেসে দিয়ে দাদী বললেন, "তুই চলে গেলে আমিও তো একা হয়ে যেতাম। তুই এই গ্রহ ছেড়ে যাচ্ছিস বলে কি মন খারাপ করছিস?"

তৃণা দাদীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, "না, ততটা খারাপ লাগছে না।"

দাদী নিজের মাস্কটা হাতে নিয়ে বললেন, "তাহলে তোর চোখে জল কেন?"

তৃণা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বললো, "এটা আমার জন্মস্থান। আমি এখানে বড় হয়েছি। এর সাথে আমার সবকিছু জড়িয়ে আছে। আমার বয়স অল্প হতে পারে। কিন্তু এগুলো তো তৈরী হয়ে গেছে, দাদী।"

দাদী তৃণার কাধে হাত রেখে বললেন, "মানুষগুলোর জন্য তোর খারাপ লাগছে না?"

তৃণা মাথা নীচু করে বললো, "লাগছে। মানুষগুলোর ক্ষুদ্রতা দেখে খারাপ লাগছে। তবে যে দেশের মানুষ এভাবে ভাবতে পারে, সেখানে আমিও থাকতে চাই না।"

একজন নভোযানবালা এসে তৃণার কাধ ধরে বললো, "তুমি এখনো তৈরী হওনি। আমরা আর তিনশ সাত সেকেন্ডের ভেতর রওয়ানা দেবো। জলদি করো।"

তৃণা শেষ বারের মতো জানালা দিয়ে আকাশটা একটু দেখে নিল। তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে বললো, "যাই।"

-*-